বাজেট

১১ বারের ঘোষকের চাপে...

আসজাদুল কিবরিয়া

১. একটি বেসরকারি স্কুলে চাকরি করেন ফারজানা। বিকেলে বাসায় ফেরার পথে মুদির দোকান থেকে চিনি কিনতে গিয়ে বিপত্তি বাধল।

'দুদিন আগেই তো ৩০ টাকা কেজি কিনলাম। আর আজ চাইছো ৩৪ টাকা। কেন?'

'আপা, পরশুদিনকার বাজেটে দাম বাড়ায় দিছে না!'

অনেকটা ক্ষিপ্ত হয়ে এক কেজি চিনি নিয়ে বাসায় এসে ফারজানা ঘোষণা করলেন, 'এখন থেকে সবাই কম কম করে চিনি দিয়ে চা খাবে।'

২. ভার্সিটির ক্লাস সেরে তারেক গিয়েছিলেন কম্পিউটারের একটা ফ্ল্যাশ ডিস্ক কিনতে। সঙ্গে বন্ধু রুমী।

'গত সপ্তাহে আমি দেড় হাজার টাকা দিয়ে কিনলাম আর আজ বলছেন ১,৬৫০ টাকা!' দাম শুনেই ক্ষেপে গেল রুমী। 'মগের মুল্লুক পেয়েছেন?'

'পেপার-পত্রিকা পড়েন না?' দোকানিও গলা চড়িয়ে দিল। 'বাজেটে যে এগুলো আমদানির ট্যাক্স বাড়িয়েছে।'

'কিন্তু আগামী মাস থেকে যেগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করবেন সেগুলোর জন্য। এটা তো আপনার আগের কেনা জিনিস। তখন তো ট্যাক্স দেননি।'

'অতো কিছু বুঝি না। বাজেটে ট্যাক্স বসছে, তাই দামও বাড়ছে। নিলে নেন, না হলে যান।'

উল্লিখিত ঘটনা দুটি বাংলাদেশের জুন মাসের সময়কার একটি খন্ডচিত্র। বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে যেদিন বাজেট ঘোষণা করেন তারপর কয়েক দিন এ ধরনের ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে। গরিব মানুষের তো বটেই, সীমিত আয়ের ও মধ্যবিত্তের ভেতরেও তাই বাজেট মানেই দাম বাড়ার আতঙ্ক।

সংবাদপত্রের পাতায় বাজেটের বিভিন্ন বিষয়ের বড় বড় হেডিংয়ের মধ্য থেকে সবার আগে সে জানতে চায় কোন কোন জিনিসের দাম বাড়বে আর কোন কোনটির কমবে। দাম বাড়ে কেন?

সোজা কথায় কর আরোপ বা কর বাড়ানো হলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কর না বাড়িয়ে বরং কমানো হয়। অথচ তখন বাজারে সেগুলোর দাম কমে না। সে ক্ষেত্রে বিক্রেতাদের যুক্তি, ওগুলো আগের জিনিস, তাই আগের দামই থাকবে। এটা মেনে নিলেও কর কমে যাওয়া জিনিসের নতুন চালান দোকানে আসার পরও কিন্তু কম দামে মানুষ তা পায় না। কারণ, করের বাড়া-কমা অনুযায়ী বাজারে দাম বাড়া-কমা তদারকি করার কোনো সুব্যবস্থা বাংলাদেশে নেই। ব্যবসায়ী-বিক্রেতারা বাজেটের অজুহাতে দাম বাড়িয়ে চড়া মুনাফা লুটে নেয়, কিন্তু কর কমার সুফল পায় না বৃহত্তর ভোক্তাসমাজ। এখানেই ব্যর্থতা সরকারের, রাষ্ট্রের। মুক্তবাজার অর্থনীতির দোহাই দিয়ে দায় এড়াতে চায় সরকার আর সুবিধা নেয় ব্যবসায়ীরা।

বাজেট বাস্তবায়নের চালচিত্র ২০০৪-০৫ (কোটি টাকায়)

মোট বাজেট	৫৭,২৮০
প্রকৃত ব্যয়*	২৬,৯৬০.২
উন্নয়ন বাজেট	২২,০০০
প্রকৃত ব্যয়*	৬,৫৯৮.৩
রাজস্ব বাজেট	৩০,৫১৮
প্রকৃত ব্যয়*	১৬৬৮৩.৭
অর্থায়ন:	
রাজস্ব আয়	৪১,৩০০
প্রকৃত আদায়*	২১৫১৯.৭
ঘাটতি*	৫৪৪০.৫

**জুলাই-ফেব্রুয়ারি*

সাইফুরের ১১তম বাজেট

এই বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আগামী ৯ জুন বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে তার ১১তম বাজেট পেশ করতে যাচ্ছেন। এর ফলে তিনি শ্রীলঙ্কার সাবেক অর্থমন্ত্রী রনি ডিমেলের সঙ্গে যুগ্মভাবে সবচেয়ে বেশিবার জাতীয় বাজেট পেশ করার কৃতিত্বের অধিকারী হতে যাচ্ছেন। সাইফুর রহমানকে এবারের বাজেটটি অবশ্য দুটি বিপরীতধর্মী চাপের মুখে প্রণয়ন করতে হচ্ছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের ক্ষমতার চতুর্থ বছর চলছে। স্বাভাবিকভাবেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চিন্তাটি তাদের মাথায় রয়েছে। সেই চিন্তা থেকেই ইতিমধ্যে সরকারদলীয় সাংসদরা উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সরকারকে বলছে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কয়েক দিন আগে সাইফুর রহমান নিজেই বলেছেন, 'বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ বলেছে, দেশে প্রবৃদ্ধি উপচে পড়ছে, বিনিয়োগে ভেসে যাচ্ছে। তাই এখন সরকারকে খরচ কমাতে হবে।' আইএমএফ সুদের হার বাড়ানো ও সরকারি কর্মচারীদের নতুন বেতন-ভাতা একবারে বাস্তবায়ন না করে খরচ কমানোর পরামর্শ দিয়েছে। এ অবস্থায় সাইফুর রহমানের জন্য দুই দিক সামাল দিয়ে এগোনো খানিকটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই দ্বৈত সংকট থেকে উত্তরণের জন্য অর্থমন্ত্রীর হাতে যে হাতিয়ার আছে তা হলো সুশাসন জোরদার করা।

সুশাসন একটি বড় পরিসরের ব্যাপার, যার অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। মোটা দাগে দুর্নীতি হ্রাস, নিয়ম নীতি মেনে চলা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাই হলো সুশাসন। নিয়মনীতি মনে চললে দুর্নীতি হ্রাস পেতে বাধ্য। দুর্নীতি হ্রাস পেলে সম্পদের অপচয় কমবে, বাড়বে যথাযথ ব্যবহার। বাজেটের আকার যাই হোক না কেন, এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাটাই যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু সম্পদের সদ্ব্যবহার করা না গেলে বাজেটটা আপামর জনসাধারণের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকলে যে কোনো অজুহাতে দাম-দর বাড়িয়ে মুনাফা লোটার প্রবণতাও রোধ করা যায়। তখন বাজেট আর আতঙ্কের বিষয় হয়ে ওঠে না।

আসলে এবারের বাজেটের ক্ষেত্রেও অর্থমন্ত্রীর জন্য দ্রব্যমূল্য ও আইনশৃঙ্খলা প্রধান দুটি চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার এখন ৬%-এর ওপরে। আর র‍্যাব, চিতা-কোবরা নামিয়েও যে আইনশৃঙ্খলার কোনো উন্নতি হয়নি তার প্রমাণ গত কয়েক সপ্তাহে রাজধানীতে ডজনখানেক খুন ও ডাকাতির ঘটনা।

কর নিয়ে বিপত্তি

বাজেট মানেই নিত্য নতুন ট্যাক্স বা কর-এমন একটি ধারণা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। আসলে কর আদায় না করে কোনো সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা সবাই কর দিতে বড্ড অনীহা প্রকাশ করি যৌক্তিক ও অযৌক্তিক কারণে। কর প্রশাসনের দুর্নীতি ও হয়রানিতে বেশির ভাগ লোক কর দিতে ভয় পায়। অন্যদিকে বড় বড় ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীরা কর ফাঁকি দিয়ে মজা পায়। বাংলাদেশের আইনজীবী ও চিকিৎসকরা মনে করেন, তারা করের উর্ধ্বে। পসার বেশি হওয়ায় যারা কোটি কোটি টাকা কামাই করেন, তাদের বেশির ভাগই নামকাওয়াস্তে আয়কর দিয়ে যেন সরকারকে ধন্য করতে চান। লাখ লাখ টাকা খরচ করে ড্রইং রুম সাজাতে আপত্তি নেই, যতো আপত্তি কর দেয়ার বেলায়। একই ধরনের প্রবণতা ব্যবসায়ীদের, বিশেষত বড় বড় ব্যবসায়ীদের বেলায়। নানা অজুহাতে কর মাফ পাওয়াই যেন তাদের লক্ষ্য। সমস্যা সরকারের দিক থেকেও আছে। কর প্রশাসনকে দক্ষ ও যোগ্য না করে এদের বরং দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নিতে উৎসাহিত করা হয়। সব মিলিয়ে আমাদের দেশে এখনো কর সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারেনি। এটি গড়ে তোলা না গেলে কর বা ট্যাক্স নিয়ে বিপত্তি বাড়বে বৈ কমবে না। বর্তমানে বাংলাদেশে রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত এখন ১০.৩%। চলতি অর্থবছরে এটি ১০.৭% এবং আগামী ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১১.২%-এ উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) দলিলে। এটি করতে গেলে কর আদায় বাড়াতে হবে, করের আওতা সম্প্রসারণ করতে হবে। অর্থমন্ত্রী যদি জনসাধারণকে করের সুফল নিশ্চিত করতে পারেন, তাহলে কর আদায় বাড়বে বৈ কমবে না। আগামী বাজেটে নির্বাচনকে সামনে রেখে সাইফুর রহমান সে ধরনের কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে।

তবে কর আদায় যদি না বাড়ে তাহলে দু' ধরনের বিপত্তি আছে। বাজেট ব্যয় মেটানোর জন্য সরকারকে হয় দেশী-বিদেশী ঋণের ওপর নির্ভর করতে হবে, অথবা ব্যয় কমিয়ে ফেলতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় অবশ্য এমনিতেই সরকারের ব্যয় অনেক কমে গেছে বা বলা যায় ব্যয় করতে পারছে না যেটুকু দরকার। চলতি ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেটের আয়তন ৫৭ হাজার ২৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে মোট যে ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ ২৬,৯৬০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের মাত্র ৪৮%। বাকি চার মাসে ৫২% ব্যয় হবে এটা অসম্ভব। এমনকি যদি ৩০%-ও হয়, তার মধ্যে বড় অংশই হবে উন্নয়ন খাতে তড়িঘড়ি করে লোক দেখানো খরচ, যাতে অপচয় হবে অনেক বেশি। ফলে উন্নয়ন ব্যয়ের সুফল জনগণ পাবে না। পাবে বিভিন্ন এলাকার সরকারদলীয় সাংসদরা, যারা বলে বেড়াবে, 'দেখো, আমি এলাকার জন্য কত কাজ করেছি।'

নতুন অর্থবছরে বাজেটের আয়তন ৬২ হাজার কোটি টাকার বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরকারকে এজন্য মোটা অঙ্কের রাজস্ব আদায় করতে হবে। তা করতে গিয়ে করের আওতা বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। আর করের আওতা বাড়লে তা অবশ্যই জনগণের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে, বিশেষ করে সীমিত আয়ের ও মধ্যবিত্তের ওপরে...

কালো টাকা সাদা হবে না!

অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন বাজেটে কালো টাকা সাদা করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। তাঁর ভাষায়, 'বারবার হারাম কাজ হালাল করার সুযোগ দেয়া যায় না।' অর্থমন্ত্রীর এ বক্তব্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার। কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ ছিল তা থেকে প্রত্যাশিত ফল আসেনি। কেন আসেনি? উত্তরটা হলো, রাজস্ব প্রশাসনের দুর্নীতি ও অদক্ষতা। যারা নির্ধারিত পরিমাণ কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ নিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রেই তারা পরবর্তীতে হয়রানির মুখে পড়েছেন। নানা কায়দায় কর প্রশাসন এদের ঝামেলায় ফেলেছে। ফলে অন্যরা আর

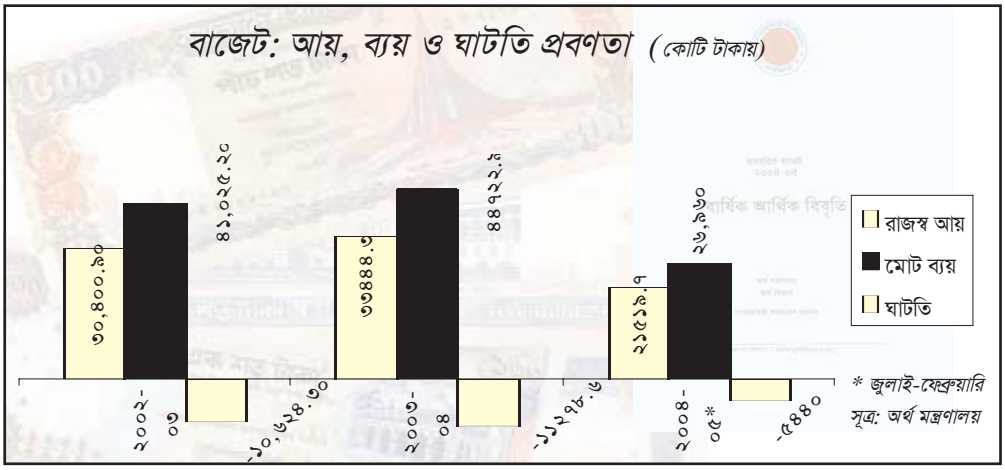

ওমুখো হয়নি। এতে করে দেশে কালো টাকার পরিমাণ বেড়েছে, যা এখন প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা। এটি কোনো সুস্থ অর্থনীতির লক্ষণ নয়। সাইফুর রহমান যতোই বলুন, কালো টাকা সাদা করার জন্য কিছু বাস্তবানুগ পদক্ষেপ নিয়ে সময় বাড়ানোই হবে যুক্তিযুক্ত। কারণ, তিনি ও তাঁর কর প্রশাসন কোনোভাবেই কালো টাকার বেশির ভাগ মালিককে ধরে-বেঁধে করের আওতায় আনতে পারবেন না, সে ক্ষমতা তার নেই। কালো টাকার মালিকরা অনেকেই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী। আবার অনেকের আয়ের কিছু অংশ করের আওতায় আছে। কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আরো কিছুদিনের জন্য না বাড়ালে সামনের দিনগুলোয় অর্থনীতিতে এর পরিমাণ আরো অনেক বেড়ে যাবে।

কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে

বাজেটের মাধ্যমে জনসাধারণকে মূলত তার আয় ও ক্রয়ক্ষমতার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার কথা। এজন্য প্রথমে স্বাভাবিকভাবেই দরকার কর্মসংস্থান। সরকার নিজে চাকরির পদ সৃষ্টি করবে বা সরকারি চাকরিতে লাখ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে এটা এখন অবাস্তব। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ড. মঈনুল ইসলামের ভাষায়, 'সরকারের কাজ তো চাকরি দেয়া নয় বরং কর্মসংস্থানের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা।' অর্থমন্ত্রী অবশ্য এসব কথায় বড়ই অসন্তুষ্ট হন। তিনি মনে করেন, দেশে কোনো বেকার নেই, সব লোকই কাজ করছে। অথচ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সদ্য প্রকাশিত 'শ্রম শক্তি জরিপ : ২০০২-০৩' যে চিত্র দিচ্ছে তা অর্থমন্ত্রীর কথার সম্পূর্ণ উল্টো। জরিপে বলা হয়েছে, দেশে মোট শ্রমশক্তির সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি। এই মোট কর্মক্ষম জনশক্তির ৪.৩% পুরোপুরি কর্মহীন যার সংখ্যা ২০ লাখের বেশি। আবার মোট শ্রমশক্তির ৩৪.২% বা দেড় কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান নিতান্তই অপর্যাপ্ত। মানে এরা যা কাজ করে সে অনুযায়ী মজুরি পায় না, বা যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না। সোজা ভাষায়, বেকারত্ব এখনো বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা। পিআরএসপি দলিলেও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এই কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। বিনিয়োগের জন্য বেসরকারিখাতকেই সবচে' বেশি ভূমিকা পালন করতে হবে।

বাজেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় পরোক্ষভাবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্থানীয় ও দেশী শিল্পকে সহায়তা দেয়া। অথচ গত জুন মাসে যখন অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করলেন, তখন হলো উল্টো। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী আমদানি শুল্ক কাঠামো চার স্তর থেকে তিন স্তরে নামিয়ে আনলেন তো বটেই, সর্বোচ্চ শুল্কহার মানে উৎপাদিত পণ্য আমদানির শুল্কহার কমিয়ে করলেন ২৫%। অথচ আইএমএফ এটা ৩০%-এ রাখায় কোনো আপত্তি জানায়নি। বিপরীতে সর্বনিম্ন হার মানে কাঁচামাল আমদানির শুল্কহার ৭.৫%-ই বজায় রাখা হলো। পরিণতি যা হওয়ার তাই হলো। দেশের বাজার গত ১০ মাসে হরেক রকমের বিদেশী পণ্যে সয়লাব হয়ে গেল। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা নতুন করে শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসার সাহস দেখালেন না। বরং যে যার মতো বিদেশ থেকে সস্তায় মাল কিনে দেশের বাজারে বিক্রির ব্যবসায় নেমে

বাজেট বাস্তবায়নের চিত্র : ২০০৩-০৪ (কোটি টাকায়)

	প্রস্তাবিত	সংশোধিত	প্রকৃত
মোট বাজেট	৫১,৯৮০	৪৯,১২৮.৮	৪৪৭২২.৯
উন্নয়ন বাজেট	২০,৩০০	১৯,০০০	১৭,০৫৮.২
রাজস্ব বাজেট	২৭,৭২৫.৩	২৬,৮০৭.৫	২৫,৬২০.৬
রাজস্ব আয়	৩৬,০৭১	৩৫,২৮৯.২	৩৩,৪৪৪.৩
ঘাটতি	-১৫,৯১০	-১৩,৮৩৯.৬	-১১,২৭৮.৬

পড়লেন। এভাবে দেশীয় শিল্পকে নিরুৎসাহিত করা হলো। সংকুচিত হলো কর্মসংস্থানের উৎস। কেউ কেউ মনে করছেন, তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে সবচেয়ে বেশি সুবিধা দেয়া উচিত। কারণ এগুলো সবচেয়ে বেশি রপ্তানি আয় করে। ধারণাটা ঠিক নয়। গার্মেন্টস শিল্প রপ্তানি আয় বেশি করে ঠিকই, কিন্তু এখানে যে পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, তার বেশির ভাগই অপর্যাপ্ত। অনিয়মিত ও স্বল্প মজুরি আর শ্রম শোষণ রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এবারের বাজেটে তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বিশেষভাবে সুবিধা দিয়ে বেকারত্ব কমানোর বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে।

কৃষিই প্রাণ

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রায় ৩০% এখনও যোগান দিচ্ছে কৃষি খাত। চলতি অর্থবছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের কথা থাকলেও নয় মাসে বিতরণ হয়েছে ৬৪%। অথচ বেশি হারে কৃষি ঋণ বিতরণ করলে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। একইভাবে বাজেটের মাধ্যমে কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ানোটাও খুবই যৌক্তিক। চলতি অর্থবছরের বাজেটে সরকার অবশ্য ৬০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছিল যার পুরোটাই এবার ব্যবহার হয়ে গেছে বিশেষত বন্যা-উত্তর পুনর্বাসনে। সমস্যা হলো, ভর্তুকির পুরো অর্থ কৃষক পায় না, যেমন পায় না ফসলের ন্যায্য দাম। ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝখানে যে বড় একটি মধ্যস্বত্বভোগী চক্র আছে, এরা একটা বড় অংশ হাতিয়ে নিচ্ছে। এজন্যই প্রশ্ন আসছে সুশাসনের, আইন প্রয়োগের।

মধ্যবিত্তের কিছু চাওয়া-পাওয়া

বাজেট যে গরিবের জন্য হয় না, তা এখন স্পষ্ট। হলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হতো, তাদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হতো। বাজেট হয় উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্তের জন্য। মধ্যবিত্ত ও সীমিত আয়ের মানুষ তাদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা অনুসারে বাজেটের প্রতি সাড়া দেয়, দিতে বাধ্য হয়। বাড়ি ভাড়া, সন্তানদের স্কুল-কলেজের বেতন, নিত্যদিনের বাজার আর ভাত-কাপড়ের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করতে পারলেই তাদের কাছে বাজেট ভালো। এসব অপরিহার্য চাহিদার পাশাপাশি মধ্যবিত্তের স্বপ্ন থাকে একটি নিজস্ব মাথাগোজার ঠাঁই বা বাড়ি, একটি গাড়ি। অথবা একখন্ড জমি। অথচ ঢাকায় বাড়ি করা বা ফ্ল্যাট কেনার ক্ষমতা দিন দিন মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটেই সরকার বাড়ি হস্তান্তরের কর ৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% ধার্য করে দেয়। নতুন পুরনো সব ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এর ফলে একদিকে যেমন রিয়েল এস্টেটের একটি সেকেন্ডারি বাজার গড়ে উঠতে পারছে না, অন্যদিকে বাসস্থানের সুবিধাভোগী হচ্ছে শুধু উচ্চবিত্ত। একইভাবে জাপানি রিকন্ডিশন গাড়ি আমদানির সুযোগ সংকুচিত করে দিয়ে বিলাসী গাড়ির সুযোগ বাড়ানো হয়েছে উচ্চবিত্তের। অন্যদিকে সস্তাদরের ভারতীয় গাড়ি আনার অবাধ ব্যবস্থা মানুষজনকে নিম্নমানের গাড়ি কিনতে বাধ্য করেছে যা প্রকারান্তরে সীমিত আয়ের মানুষের ব্যয়ভার বাড়াচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, নতুন বাজেটে কালো টাকা সাদা করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। তাঁর ভাষায়, 'বারবার হারাম কাজ হালাল করার সুযোগ দেয়া যায় না।' অর্থমন্ত্রীর এ বক্তব্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার। কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ ছিল তা থেকে প্রত্যাশিত ফল আসেনি...

সব বোঝা জনগণের ঘাড়ে

নতুন অর্থবছরে বাজেটের আয়তন ৬২ হাজার কোটি টাকার বেশি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরকারকে এজন্য মোটা অঙ্কের রাজস্ব আদায় করতে হবে। তা করতে গিয়ে করের আওতা বাড়ানো ছাড়া উপায় নেই। আর করের আওতা বাড়লে তা অবশ্যই জনগণের ঘাড়ে গিয়ে পড়বে, বিশেষ করে সীমিত আয়ের ও মধ্যবিত্তের ওপরে। উচ্চবিত্তরা বিভিন্ন ভাবে এতো বিত্তশালী ও শক্তিশালী যে, তাদেরকে কোনো কিছু স্পর্শ করে না। তারাই যোগান দেয় মন্ত্রী-এমপিদের নির্বাচনের খরচ, বিলাসিতার উপকরণ। তারাই নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি। ফলে অর্থমন্ত্রী তাদের আয় অনুসারে কর দেয়ার জন্য চাপ দিতে পারেন না, চাপটা স্থানান্তর করে দেন নিচের দিকের মানুষের ওপরে। মানুষ ভ্যাট দেয়, পায় না সুফল। চলতি অর্থবছরের বাজেটে সিএনজি বাস আমদানির শুল্ক কমানো হয়েছিল। ফলে প্রচুর সিএনজি বাস এসেছে। ঢাকার রাস্তায় পরিবহনে এর প্রাধান্য বাড়ছে। কিন্তু সিএনজি বাসের ভাড়া কম হয়নি।

ইতিমধ্যে নির্বাচনী হাওয়া যেন লেগে গেছে বিভিন্ন স্তরে। নির্বাচনে ভোট টানতে আর ভোটার তুষ্ট করতে অপ্রয়োজনীয় অনেক কাজেই অর্থ ব্যয় হবে, অপচয় হবে। এতে করে একশ্রেণীর মানুষের হাতে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ আসবে। ফলে তৈরি হবে মূল্যস্ফীতি। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে হারে বেতন-ভাতা বেড়েছে তাতেও আসলে মূল্যস্ফীতির চাপ সামলানো সহজ হবে না। আর তাই মূল্যস্ফীতির চাপে পিষ্ট হবে সীমিত আয়ের মানুষ। কারণ জিনিসপত্রের দাম বাড়বে যার চাপ ইতিমধ্যে জনগণ টের পাচ্ছে। আমরা পরিষ্কার করেই বলেছি চাপটা দু'দিক থেকে আসবে। যদিও ধারণা করা হচ্ছে যে নির্বাচনকে সামনে রেখে সাইফুর রহমান ট্যাক্স বৃদ্ধি সেভাবে করবেন না। বরং কিছু ক্ষেত্রে কমতে পারে। তবে সেটার সুবিধা নেবে মুষ্টিমেয় আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী। অন্যদিকে বাছ-বিচারহীন উন্নয়ন ব্যয় বাজারে অর্থের যোগান বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। বড় অঙ্কের বাজেট তৈরি করে বাহবা কুড়ানো যদি অর্থমন্ত্রী তথা সরকারে উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বড় বাজেট তৈরি না করাই ভালো।

গত কয়েক বছর ধরে বড় অঙ্কের বাজেট বিশেষত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি দেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তার ৯০%-ও বাস্তবায়িত হয় না কাটছাঁট করার পরও। খরচ যা হয় তার বেশির ভাগই অর্থবছরের শেষ তিন মাসে মানে তাড়াহুড়ো করে। এবারও সে অবস্থা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাতে জনগণের ঘাড়ে বোঝাটা আরো বাড়ে। কারণ তাড়াহুড়ায় অপচয় বাড়ে, সম্পদের অপব্যবহার হয়। অথচ এর অর্থ যোগান হয় কর অথবা ঋণ থেকে। ঋণের সুদের ব্যয়ভারও তো জনগণের করের টাকা থেকে মেটাতে হবে।